গবুচন্দ্র

আমরা চার ভাইবোন ছোটবেলায় সুকুমার রায়ের “হযবরল” মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম বলা যাইতে পারে। সকলের মাথার মাঝে “হযবরল”এর চরিত্র সমুহ খেলা করিত। একদিন আমার ছোট ভাই একাই হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলো,

-আচ্ছা, বল তো, কারো নাম যদি “রু” হয় তবে তার মাকে রুর মা বলে ডাকলে উনি রাগ করবেন কেন?

আমি কিছুটা বিরক্ত হইয়া বলিলাম,

-তুই “হযবরল” এর “হিজিবিজিবিজ” হয়ে গিয়েছিস। কারো নাম ‘রু” হবেই বা কেন, তার মা'কে রুর মা ডাকলে তিনি রাগই বা করবেন কেন, আর এসব হিজিবিজিবিজ মার্কা ভাবনাতে তুই একাএকা হাসবিই বা কেন?

ভাই উত্তর দিল,

-আহা, তুমি রুর বলতে “ব'য় শুন্য র” ভাবছো কেন, ওটাকে “ঢ'য় শুন্য র” করে দাও, মানে, রুঢ় মা।

আমার ছোট ভাইয়ের মত আজকাল আমাকেও মাঝে মধ্যেই এই ধরনের অদ্ভুত সমস্ত ভাবনায় পাইয়া বসে। যেমন, সেদিন হঠাৎ ভাবনায় পাইয়া বসিলো, কবিগুরু এতো নাম থাকিতে গবুচন্দ্র মন্ত্রী নামটা বাছিয়া লইলেন কেন? পরে মনে হইল, শুদ্ধ বাংলায় গরুকে গব্য বলা হইয়া থাকে এবং তাহারই অপভ্রংশ হইতে "গবু" নামটা তিনি বাছিয়া লইয়াছেন। আবিষ্কার তো করিলাম কিন্তু কেন যেন ছোট ভাইটার মত হাসিতে পারিলাম না। আসলে ছোট ভাইটা তখন নিতান্তই ছোট ছিল বোধহয়, আমার এখন বয়স হইয়াছে তো, যে কারণে এই সকল আবিষ্কার আর হাসাইতে পারে না।

আজকাল সোস্যাল মিডিয়ার কল্যানে মুহুর্তেই ঘরের হাড়ির খবর পৌঁছাইয়া যায় সকলের নিকট। সেই রকমই একটি খবরে আমার রীতিমতো ভীমড়ি খাইবার জোগাড় হইল। কোন একজন দায়ীত্বশীল ব্যক্তি পরিকল্পনা করিয়াছেন, কাঁঠালকে কি ভাবে সভ্য করা যায় সেই বিষয়ে গবেষণার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা খরচ করিবেন। হইলো না কাম। এইবার বোধহয় সভ্যতার ইতিহাসই বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। সনাতনী সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগ অথবা প্রস্তর-ব্রোঞ্জ-লৌহ যুগ তো শিঁকেতে উঠিলোই, এখন হইতে সিলেবাসে ঢুকিবে আম্রো-জাম্রো-লিচ্যুরো-কাঁঠাল্রো যুগের ইতিহাস। ওহ নাহ, উহা তো যুগের কথা বলিলাম, সভ্যতার ইতিহাস বলিতে হইলে তো বলিতে হইবে আসিরিও-ব্যাবিলোনিয়-মিসরীয়-গ্রীক-রোমান ইত্যাদি সভ্যতার ইতিহাস। সকল সভ্যতার সময়ই উক্ত সভ্যতায় বসবাসকারীরা এমনকি নিকটতম প্রতিবেশীকেও মনে করিতো বর্বর-অসভ্য। এমতাবস্থায় কাঁঠালকে সভ্য করিয়া তোলা সম্ভব হইলে আম-জাম-লিচু ইত্যাদি ফল সমুহ অসভ্য-বর্বর ফল হিসাবে চিহ্নিত হইবে কিনা তাহা লইয়া আমি বিশেষ চিন্তিত।

সমস্যার সমাপ্তি এইখানে টানিতে পারিলে ভাল হইত কিন্তু পারিলাম না, কারণ, একই সময়ে তাহার আরো একখানা অমৃত বচন আমাকে বেশ ঝামেলাতে ফেলিয়া দিয়াছে। উনি বলিয়াছেন,
- গরু যদি কচুরিপানা খেতে পারে তবে মানুষ কেন খেতে পারবে না।

তাহার আহ্বানটা অনেকটা এইরকম, হে গবেষক বৃন্দ, অবধান কর, যত ইচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা খরচ করিতে থাকো, তবুও এইবার মানুষকে গরু বানাইবার ফর্মুলা আবিষ্কার করিয়াই ছাড়িবো ইনশাআল্লাহ। ভালই তো বলিয়াছেন, ইহাতে সমস্যা কোথায় ধরনের কথা বলিবার মত মানুষের অভাব হইবার কোন কারণ নাই। তাহাদের সহিত গলা মিলাইয়া আমিও বলিতে পারিতাম, সমস্যা কোথায়, তিনির মত মান্যবরেষুরা আমাদের মত সাধারন আম-জনতাকে গরুর মর্যাদা দান করিয়া আম্রসভ্যতা হইতে গব্যসভ্যতায় লইয়া যাইতে

চাহিতেছেন, ইহাতে তো আমাদের শুধু আনন্দিতই নহে আহ্লাদিতও হইবার কথা। অন্তত আমি তো আহ্লাদিত বটেই কিন্তু সমস্যা হইল, তিনি গরুকে মানবসভ্যতায় স্থান করিয়া দিবার লক্ষে গবেষণা করিতে চাহিতেছেন নাকি মানবসভ্যতাকে গব্যসভ্যতায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা।

তাহার বচনামৃত ব্যঞ্জনাময় হইয়া আমাদের সদ্যোজাত গব্যসভ্যতার খাইবার টেবিলেও তীব্র আঘাত হানিয়াছে। হঠাৎ তাহার নিকট হইতে আমরা বাংলাদেশের মানবেরা জ্ঞান লাভ করিলাম, আমরা নাকি এখন অর্থনৈতিক ভাবে চতুর্থ এবং তাহার ভাষ্যমতে বাংলার মানবসমাজ সেই কারণেই আজকাল কেবলমাত্র মুরগী ভক্ষণকারী প্রাণীতে পরিণত হইয়াই ক্ষান্ত নহে বরং পোলাও-কোর্মা খাইবার জন্য এতোটাই ব্যস্ততার মাঝে তাহাদের দিনাতিপাত করিতে হয় যে, তাহারা ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরু দায়ীত্বের কথাও ভুলিয়া যায়।

ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি তাজমহল বানাইয়াছেন সম্রাট শাজাহান। পরিলামনা জ্বালায়। একা সম্রাট শাজাহান এতো বিশাল কর্মসাধন করিলেন কি করিয়া? পরে বুঝিলাম, তিনি তখন সম্রাট ছিলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারও তাহার। অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া তিনি যে পাপাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপমোচনের ইচ্ছাপুরনের ইতিহাস এই তাজমহল। যেই কারণে, তাজমহলের মূল পরিকল্পনাকারী কে ছিলেন, আর কাহারাই বা এই স্থাপত্য তৈরীর মূল প্রকৌশলি ছিলেন অথবা বাইশ হাজার শ্রমিক বা অন্য সব কিছুই পরিসংখ্যানের খাতায় নাম লেখাইয়াছে।

ইতিহাসের পাতায় শাজাহানদের নামই শুধু থাকিয়া যায় কিন্তু মাঝে মধ্যেই যখন কাব্যের পাতায় গবুচন্দ্র মন্ত্রীর সহিত হবুচন্দ্র রাজার নামও স্থান করিয়া লয়, যখন এইসব গবুচন্দ্র-সম্রাজ্ঞী-পাপী-য়াদের সৃষ্টি রহস্য খুঁজিয়া পাইনা, তখন স্বাভাবিক ভাবেই একটা ভয় মনের মাঝারে আকুলি-বিকুলি করিয়া ওঠে, মনে হয়, ইহাদের কারণেই না হবুচন্দ্রদের নামও ইতিহাসের পাতায় স্থান পাইয়া যায়। কাব্য আর ইতিহাস তো এক বিষয় নহে, ইতিহাসের পাতায় শুধুই হবুচন্দ্র-শাজাহানদেরই নাম থাকিয়া যায়।

(সমাপ্ত)